لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ

২৭ জুন ২০১২ ওয়াশিংটন ডিসি-র **‘ক্যাপিটল হিল’** (কংগ্রেস ভবন)-এ প্রদত্ত

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা’তের পঞ্চম খলীফা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ভাষণ

<u>যারা হুযূর (আই.)-কে ক্যাপিটল হিল-এ স্বাগত জানান</u>

রবার্ট ক্যাসি
সিনেটর (ইউএস পিএ)

ক্যাটরিনা লেনটস্ স্যুয়েট
ইউএস কমিশন ফর ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর সভানেত্রী

কীথ এলিসন
প্রথম মুসলিম কংগ্রেসম্যান (ইউএস এমএন-৫)

ফ্রাঙ্ক উলফ্
কংগ্রেসম্যান (ভিএ-১০)

ব্র্যাড শেরম্যান
কংগ্রেসম্যান (ইউএস সিএ-২৭)

জো লোফগ্রেন
কংগ্রেস সদস্যা (ডি-সিএ)

ন্যান্সি পেলোসি
ডেমোক্রেটিক দলনেত্রী

জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই
বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত ভাষণ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন– তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে ‘বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়’। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি “জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামী শিক্ষা”-এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য তুলে ধরবো।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না।

আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদসত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য। আর তাই নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।

বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেক উদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন রূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা-ই হবে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করবো।

হুযূর (আই.)-কে কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শেরম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা প্রদান করছেন

একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ক্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকে না। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে। অন্যথায়, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস জাগতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ‘লীগ অব্ নেশন্স্’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ক্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক ‘লীগ’ থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি।

কংগ্রেসম্যান মাইক হোন্ডা (সিএ-১৫) হুযূর (আই.)-এর সম্মানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করছেন

'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এটা পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।

এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি-নির্ধারণের উপলক্ষ হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন হলো, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি? পবিত্র কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নতা বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল একথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন

ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরও বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান– এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতমুক্তভাবে সম-অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য আছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত আর এজন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরূদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক যারা ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, যেখানে যে-ই তোমাদেরকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যেক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়, তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ইসলাম যে ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরার ১৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও

১১৯ জন উপস্থিত শ্রোতার মাঝে ছিলেন সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, কূটনীতিক ও নীতি-নির্ধারকবর্গ

সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার একাজ করা উচিত।

নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনের সুযোগ সন্ধান না করে। বরং, উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি শর্তের কথা পবিত্র কুরআনের ১৫ নম্বর সূরার ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোন পক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষার বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যা অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্প-শিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরনের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য শুনছেন

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপরও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণ এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ চটে আছে। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে– যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা-সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সবসময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই– এটি হলো এর দাবী। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে নিঃস্বার্থ সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবী। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায়-নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, যখন দু'টি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ

এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মিমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মিমাংসায় উপনীত হবার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মিমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরূদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হলো অস্থিরতা, যা আরো বীভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন কোন এক পক্ষ এর বিরূদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যেসব দেশ ন্যায়বিচারের দাবী পূরণের লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে

অনুষ্ঠান শেষে হুযূর (আই.) দোয়া পরিচালনা করছেন

চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে বিশুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিৎ, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এরকম ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সে সব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগদ্বাসী সবসময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভ করে (আমীন)। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

ক্যাপিটল হিল-এর কর্মকর্তারা হুযূর (আই.)-কে কংগ্রেস ভবন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন